Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 01-10
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শম্ভু মিত্রের ছোটগল্প : শৈল্পিক চেতনায় বাস্তবতার বৃত্তায়ন

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Shambhu Mitra is the eminent actor and famous dramatist of modern Bengali drama. In the parallel comparison and criticism in between Shambhu Mitra,Utpal Dutta and Ajitesh Bandyopadhyay, it has been always discussed and concluded many time that the dramatic compositions of Shambhu Mitra was mainly built by the conceptual idealism and artistic construction of Rabindranath Tagore. The limited number of short stories written by Shambhu Mitra are also very important in many ways. The unique sense of presenting the dramatic realism and artistic style of presentation have also made these sort stories very essential to read. His short stories are: Swapner Majhe Ekti Drishya (1940), Sonkromon (1943), Tintala (1946), Asamoyik (1962), Aranye (1963) and Kalidahe (1964). The real life of artists in different field of work with their problems related to their art-life has been keenly analyzed in these stories. The aspects like author's consciousness and attitude towards life, self image, contemporary dramatic revolution, socio-realism, irony etc. are also being projected vastly in those creations.

মূল রচনা: শম্ভু মিত্রের নাটকের পাশে তাঁর ছোটগল্পগুলি হিমালয় পর্বতশ্রেণীর পাশে ক্ষীণতোয়া নদীর মতো মনে হলেও সাহিত্যিক ও সামাজিক ভাবাবেদনের দিক থেকে তার মূল্যাংশ কোনো অংশে কম নয়। বিশেষতঃ তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের পাশে উপরি পাওনা হলো এর নাট্যগুণ। শম্ভু মিত্র সর্বকালের সেরা খ্যাতিমান নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও শক্তিমান নাট্যাভিনেতা। নাট্যত্রয়ী উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের নানা আলোচনা ও সমালোচনায় বারে বারেই উঠে এসেছে শৈল্পিক নির্মিতির স্বপক্ষে তাঁর রবীন্দ্র ভাবাশ্রয়ীতার কথা। নাটকের ব্যাপ্তির তুলনায় তাঁর লেখা ছোটগল্পের পরিসর একান্তই সীমিত। তবু সেখানেও নাট্যসুলভ জীবন্ত বাস্তবের অনুসৃতিকেই গল্পকার তুলে ধরেন তাঁর স্বভাবজ শৈল্পিক ভাবনা ও সৃজন ভঙ্গিমায়। ছোটগল্পের মধ্যেও যে এত নাটকীয়তা থাকতে পারে তা শম্ভু মিত্রের গল্পগুলি না পড়লে বোঝা যায় না! উপরন্তু এই শৈল্পিকতাও যেন অনেকাংশেই রবীন্দ্রানুভবেরই এক অন্যতর প্রাপ্তি বলে মনে হয়।

চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত লেখা শম্ভু মিত্রের ছোটগল্পের সংখ্যা মাত্র ছটি। ১৯৪৩ সালে নাট্যাভিনেতা হিসাবে শম্ভু মিত্র খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন। তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত তারও পূর্বে। তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য' প্রকাশ পায় ১৯৪০ সালে। গল্পটি তাঁর বোম্বের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম যৌবনে লেখা গল্প এটি। গল্প লেখার শুরুতেই যে চিন্তাধারা ও ভাষার নমুনা এ গল্পে দেখা যায়, তার উৎকর্ষ অবাক করার মতো। 'সংক্রমণ' গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৩ এবং গল্পটি ১৯৪৪ সালে 'অরণি' পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক জীবনের একেবারে শেষ পর্বে আনন্দ পাবলিশার্স তাঁর পাঁচটি গল্প ও

দুটি নাটিকা একত্রে সংকলিত করে 'পাঁচ-দুই' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। লেখকের 'তিনতলা' গল্পটির রচনাকাল ১৯৪৬ সাল এবং গল্পটি ঐ বৎসরেই 'অরণি' পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'অসাময়িক' গল্পটির রচনাকাল ১৯৬২। এ গল্পটিও 'বহুরূপী' পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যায় (১৯৬২) প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত চারটি গল্প একত্রে আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র', ১ম খন্ডে (জানুয়ারী, ২০১৪) স্থান পেয়েছে। শম্ভু মিত্রের লেখা 'অরণ্যে' গল্পটি প্রকাশ পায় 'বহুরূপী' পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯৬৩) এবং 'কালীদহে' গল্পটি ১৯৬৪ সালে রচিত হলেও 'অমৃত' পত্রিকায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

তাঁর গল্পগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে, এর কোনোটিতে গল্পকার যেমন প্রত্যক্ষভাবে শিল্পী সত্তা তথা শিল্পচেতনার বিচারে বাস্তবসত্যকে বিচার-বিশ্লেষণ সহ তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন তেমনই কোনো কোনো গল্পে এক অন্তর্লীন শৈল্পিক চেতনায় বাস্তবতার বৃত্তায়নকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। নিয়মিত গল্পলেখক না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গল্পগুলি সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ কোণগুলিকে ছুঁয়ে আছে। প্রায় 'মিথ' হয়ে ওঠা তাঁর অমর নাট্যসৃষ্টি 'চাঁদ বণিকের পালা'-র লক্ষণাক্রান্তও তাঁর কোনো কোনো গল্পের অন্তরঙ্গ সুর। সঙ্গীত, চিত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি শিল্প ভাবনার পাশাপাশি খাঁটি নাট্যাদর্শ ও নাট্যকারের জীবনদর্শন নাট্য আন্দোলনের বিস্মৃত ইতিবৃত্ত সমেত তাঁর গল্পের এক মহৎ ও শৈল্পিক প্রকাশ হয়ে উঠেছে। বস্তুতইঃ তাঁর বেশীরভাগ গল্পই বাস্তবতার বিচারে সিদ্ধ। দু'একটি গল্পে (যথা 'স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য') আছে মেদুর অধিবাস্তবতার পরশ তথা রোমান্সসুলভ এক ভাবাতিশয়তা, যাকে অনেকটাই ছায়াচ্ছন্ন, বিমূর্ত ও অবিমিশ্র নাট্যভাবনারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, শম্ভু মিত্রের গল্পগুলি তাঁর নাটকের মতোই বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নিয়ে বাংলা গল্পসাহিত্যে একদিকে যেমন নতুনতর ভাবনার পথকে প্রশস্ত করেছে তেমনই আধুনিক জীবনযন্ত্রণার প্রকট রূপায়ণেও সহায়তা করেছে।

গল্পগুলিকে একসাথে এবং একনজরে পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে ('স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য' গল্পটি বাদে) তা হলো এর প্রতিটিই শিল্প (Art) কেন্দ্রিক অথবা শিল্পী (Artist) কেন্দ্রিক গল্প। শিল্পীজীবনের নানা সমস্যা, শিল্পের প্রতি সামাজিক দায় ও দায়িত্বের প্রতিকূলে শিল্পী জীবনের অপ্রাপ্তি ও অসার্থকতার ক্ষেত্রটি প্রায় গল্পেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই সমগ্র গল্পের আবহটিকে গড়ে তুলেছে শিল্প, শিল্পীর জীবন এবং তৎসহ অবশ্যই তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও ফল। প্রাতিবেশিক এই প্রভাব ও তার ফল কখনও শিল্পীর জীবনকে কেন্দ্র করে গল্পে আবর্তিত হয়েছে অথবা কখনও শিল্পীর শিল্পসত্তার প্রভাবে প্রাতিবেশিক জীবন আলোড়িত হয়েছে। ফলতঃ এই শিল্পকেন্দ্রিকতাই শম্ভু মিত্রের গল্পগুলিকে একটি অভ্যন্তরীণ তথা ভাবগত ঐক্য দান করেছে। অন্যদিকে শিল্পীদের সকলেই যে শিল্পকে তাঁদের জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার প্রভাব ও সর্বশেষ ফলকেও চূড়ান্ত বাস্তবতার সাথে গল্পের অন্তিম পরিণতিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। বস্তুতঃ এ বাস্তবতা গল্পের অন্তিম বিন্দু পর্যন্ত সঞ্চারিত। সেদিক থেকে গল্পকার শম্ভু মিত্রকে খাঁটি বাস্তবতার কারিগর বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর 'অসাময়িক', 'অরণ্যে' ও 'কালীদহে' গল্প তিনটি 'ক্ষণেশ প্রসাদ দত্ত' ছদ্মনামে লেখা (ঠিক যেমনটি 'সুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়' ছদ্মনামে নাট্য সমালোচনা করেছিলেন তিনি কিংবা 'শ্রীবটুক' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'চাঁদ বণিকের পালা')। একজন পুরোদস্তুর পেশাদার গল্প লেখকের ন্যায় খাঁটি বাস্তবতার এই অনুসন্ধানই তাঁর গল্পকারসত্তার শক্তিমত্তাকে প্রমাণ করে।

'সংক্রমণ' গল্পের মূল চরিত্ররা হলো বাণীপদ, ভোলানাথবাবু, গোপালবাবু, অরিন্দম, তারাগতিবাবু, শান্তি (অরিন্দমের স্ত্রী), মেনকা (গোপালবাবুর স্ত্রী) ও ষোলো বছরের এক কিশোর দিলীপ। বাণীপদর গাওয়া রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীত কিভাবে শ্রোতাদের মনকে প্রভাবিত করলো এবং সেইসূত্রে তাদের জীবনের নানা দিকগুলি ফুটে উঠলো তারই গল্প হলো 'সংক্রমণ'। পূর্ণতা-অপূর্ণতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক অনুভব ও উপাদানে গড়া এ গল্পটি যে অভিনব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গল্পের প্রতিটি শ্রোতা চরিত্রের মধ্যে দিয়েই বাণীপদর গাওয়া সঙ্গীতের অনুভূতি পৃথক পৃথক ভাব সংবেদন সৃষ্টি করেছে। কোনো কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে (যেমন শান্তি) বিষয়টি

ব্যক্তিজীবনের বেদনার্ত স্মৃতিকেও জাগিয়ে তুলেছে। বাণীপদর শ্রোতাদের মধ্যে যেমন আছেন ভক্তিবাদী তারাগতিবাবু যাঁর মধ্যে বিশ্বাস আর সন্ন্যাস দুই-ই প্রবল, তেমনই আছে যুক্তিবাদী অরিন্দম—সঙ্গীতসৃষ্ট তথাকথিত সেন্টিমেন্টকে যে আড়াল করতে চায় ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা ব্যঙ্গ-হাসি রূপ আত্মরক্ষার কপট অস্ত্র হেনে। অথচ অরিন্দমের স্ত্রী শান্তির ভাবনাসূত্রে উঠে আসে তার ব্যর্থ জীবন। তারই মানসিক প্রতিবিম্বে আমরা জানতে পারি, অরিন্দম আসলে দ্বৈতসত্তার অধিকারী। স্ত্রীর সাথে অরিন্দমের ব্যবহার কখনও পশুসুলভ যৌনসঙ্গমকারী, আবার কখনও সে স্ত্রীর কাছে আশ্রয় খোঁজে সর্বহারা, রিক্ত পুরুষের ন্যায়। তখন অরিন্দমের ব্যবহার শান্তির কাছে সন্তানের মতো মনে হয়। কখনও বেপরোয়া লম্পট আবার কখনও হতাশ প্রেমিকের এই সান্নিধ্য শান্তিকে ক্রমশঃ বঞ্চিত আর লজ্জিতই করে তোলে। তার অতৃপ্তি বেড়ে চলে। বাণীপদর সাঙ্গীতিক প্রভাবাবিষ্ট শান্তির মনের প্রতিক্রিয়া থেকেই শান্তির মনের অপূর্ণতার এ চিত্র ধরা পড়ে। গল্পের ভোলানাথবাবুর মধ্যে যুক্তি ও আবেগের এক দ্বন্দ্ব তথা দোলাচল আছে। যদিও বাণীপদর গাওয়া গান তাঁর, গোপালবাবু ও অরিন্দমের চোখে জল এনে দেয়, তবু তাঁর ও অরিন্দমের মধ্যে এ বেদনাশ্রু লুকানোর এক সযতন প্রয়াসও এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়। প্রৌঢ় গোপালবাবু এ গল্পে সম্বিতহারা ও আবেগপ্রবণ এক শ্রোতা। চোখের জল লুকানোর কোনো চেষ্টাকৃত প্রয়াস তাঁর নেই। কিন্তু প্রৌঢ় ভোলানাথবাবুর তা আছে, যদিও তা অরিন্দমের ন্যায় সাবধানী ও সচেতন প্রয়াস কখনই নয়। তাঁর শিক্ষা আর যুক্তি কোনো এক প্রাথমিক আড়াল তুললেও অমলিন শান্তির আবেগ অচিরাৎ তা ভেঙ্গে দেয় আর ভোলানাথবাবু ভাববিহ্বল হন। মেনকা (গোপালবাবুর স্ত্রী) পাড়ার 'সরকারী বউদি' (কথাটি ব্যঙ্গচ্ছলেই বলেন গল্পকার)। বাণীপদর গান শুনে তাঁর মনে অস্থির কামনার দোলা লেগেছে, এবং তা বাণীপদকে কেন্দ্র করে। প্রায় বিগতযৌবনা মেনকার এই অনুভব এক অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দেয়। কিশোর দিলীপের অন্তরে আছে বলিষ্ঠ জীবনের ডাক। বাণীপদর গানের কলি তার মনে অশান্ত উল্লাস আর আত্মঘোষণার এক আশ্চর্য অনুরণন তোলে। সজোরে হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে সে কাঁপতে থাকে।

সমগ্র গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রৌঢ় থেকে কিশোর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের চরিত্র সাপেক্ষে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের প্রয়াস করেছেন গল্পকার। প্রৌঢ়ের বাধাহীন মনতরী, যুবকের রেশন্যালিস্ট পাথর-চাপা ইমেজের বুকে ঘা খাওয়া আকস্মিক বিহ্বলতা, তরুণীর নষ্ট, লাঞ্ছিত ও অবমানিত দাম্পত্যের বুক চাপা কান্না, প্রৌঢ়ার সমাজ-অনোনুমোদিত কামনার সংগুপ্ত উচ্ছ্বাস, কিশোরের ছাইচাপা দ্রোহাকাঙ্খা—এসব সমাজেরই ভিতরকার ছবি। গল্পকার সেগুলিকেই টেনে বের করে মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবসম্মতভাবে তার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস করেছেন। সেদিক থেকে গল্পটিকে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণীর গল্প বলাই যায়। শম্ভু মিত্রের নিজের কথামতো 'সৃষ্টি শুধু বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক হলে চলবে না, তাতে মহত্তর এক সামাজিক কাঙ্খা থাকতে হবে'—একথারও পূর্ণ সমর্থন মেলে এ গল্পে। তৎসহ গল্পের 'সংক্রমণ' নামটিও সার্থক। 'সংক্রমণ' শব্দের অর্থ 'সঞ্চরণ' বা 'গমন'। আবার এক দেহ থেকে অন্য দেহে রোগের সংক্রান্তিকেও 'সংক্রমণ' নামে চিহ্নিত করা হয়। এ গল্পে 'সংক্রমণ' নামের মধ্যে দিয়ে বাণীপদর গান যেভাবে শ্রোতৃ মন্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তার যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তেমনই সমাজের পচন ও ক্ষত নামক বিষাক্ত অসুখগুলি কিভাবে আমাদের একে-অপরকে আবিষ্ট তথা সংক্রামিত করে চলেছে তারও কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। আসলে বাণীপদর গান এ গল্পে উপলক্ষ্য মাত্র। গল্পকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এই সংক্রমণকে তুলে ধরা। তাঁর সমকালীন নাটক 'উলুখাগড়া'-র সঙ্গেও এ গল্পের ভাবগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

শম্ভু মিত্রের গল্পের ভাষাশৈলী কোথাও ক্ষুরধার, তীব্র ব্যঞ্জনাময়, অন্তর্ভেদী ইত্যাদি বহুবিদ অভীধায় গড়া। কখনও তা রাবীন্দ্রিক আবার কখনো বা প্রমথ চৌধুরী সুলভ ইন্টেলেকচুয়ালিজমের ছোঁয়ায় তা চকমকে। শেষোক্ত দুটির ছোঁয়া এ গল্পেই মেলে। অরিন্দমের মনের ভাবনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে গল্পকার বলেনঃ—

> *"একি অরিন্দম, তুমিও সেন্টিমেন্টাল, ছি ছি! সোজা হয়ে বসে নিজের বুদ্ধির প্রতি সেই ব্যঙ্গ হাসিটাকে ঠোঁটাগ্রে তীক্ষ্ণ করে ধরে সে গান বিচার করতে বসল। নিজেকে বিশ্বাস করাতে তার দেরী হল না যে,*

চোখের জলটা তার একটা অ্যাকসিডেন্ট, স্বরগ্রামের দু'একটা পর্দার সঙ্গে তার অশ্রুগ্রন্থির কোনো নিগূঢ় সংযোগের পরিচয়। আসলে গানটা কিছু নয়, এ ধরনের রামপ্রসাদী সুর চৌদ্দশো গানে শোনা গেছে, কেবল আখর ঢোকালেই যে সাধারণ গানের কিছু intrinsic value বাড়ে তা নয়, তবে হ্যাঁ, দু'একটা খোঁচ মন্দ না, লোকটা একটা tolerable artiste.''[১]

গল্পের এ ভাষা একেবারে হাল আমলের বলেই মনে হয়। ইন্টেলেকচুয়ালিজমের দীপ্তিতেও তা ভাস্বর। আবার অরিন্দমের স্ত্রী শান্তির বর্ণনায় লেখক বলেনঃ

"গান শুনতে শুনতে তার মনে পড়ে যাচ্ছিল তার বাল্যকালের কথা। প্রত্যেক রবিবারে একজন বোষ্টম তাদের বাড়িতে গাইতে আসত। খিড়কির দরজা খুলে তাকে ডেকে আনা হত অন্দরের উঠোনে। তারপর সেইখানে মা-খুড়িরা নিজেদের সাংসারিক কাজ করতে করতে এবং ছোট ছেলেমেয়েরা রোয়াকের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে তার গান শুনত।"[২]

এ বর্ণনাটির রবীন্দ্রনাথের কোনো চেনা গল্পের মতই পরিচিত ভাষা বলে মনে হয়। এছাড়াও এমন অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পেই।

'তিনতলা' গল্পটি এক চিত্রশিল্পী, একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও কিছু মেহনতী মানুষের পারস্পরিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে রচিত। 'তিনতলা' গল্পে তিনতলা বাড়ীটির একতলায় থাকে অবিনাশের কারখানার কাঠ মিস্ত্রীদের দল, যার মধ্যে আছে আবদুল ও তার পরিবার। দোতলায় থাকেন যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে যাওয়া বাড়ির মালিক অবিনাশ, তার স্ত্রী, দুই ছেলে সুবিমল ও সুনির্মল, স্বামী পরিত্যক্তা একমাত্র কণ্যা ও তার পুত্র (অবিনাশের একমাত্র দৌহিত্র) মিন্টু। আর তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে থাকেন ভবানীপ্রসাদ নামের সেই চিত্রশিল্পী যাকে বন্ধু অবিনাশই দিয়েছেন আশ্রয়। ভবানীপ্রসাদের কাছে আছে নানা বিদগ্ধ মানুষজনের আসা-যাওয়া। অবিনাশের পাঁচ বছরের দৌহিত্র মিন্টুর অনুভবের মধ্যে দিয়ে তিনটি তলার মানুষদের পারস্পরিক ভাবনা ও পার্থক্যগুলিকে গল্পকার পরতে পরতে সাজিয়ে তোলেন এ গল্পে। ভবানীপ্রসাদের জীবনচর্চা সম্পর্কে মিন্টুর মনে আছে এক অদম্য কৌতূহল। যদিও খুব কাছ থেকে কখনও সে কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটেনি। বরং কাঠের আর বার্নিশের গন্ধে ভরা একতলার দুনিয়াকে অনেকবার কাছ থেকে দেখেছে সে। উপলব্ধি তার সামান্যই কিন্তু দেখাটা কখনই মিথ্যে নয়। বার্নিশ আর রং-এর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আবদুল ও তার পরিবারের হাসি-কান্না-কলহের সাদা-মাঠা পৃথিবী বারবার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তার মনে। কি এক অজানা আকর্ষনে সে বারবার নেমে এসেছে একতলায়। আর সেখানেই তার ছোট্ট দৃষ্টির সামনে কোন এক সন্ধ্যালোকিত পটভূমিতে অভিনীত হয়েছে জীবনের কোনো এক বিমূঢ় অধ্যায়। ঘুন ধরা এক অন্ধকার আবহে সে তার মাকে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রথমে এগিয়ে যেতে ও পরে চড় মারতে দেখেছে মদ্যপ আবদুলকে। ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে গিয়েছে সে। একই দৃশ্য তিনতলা থেকে দেখেছেন শিল্পী ভবানীপ্রসাদও। পাঁচবছরের মিন্টুর কাছে যা দুর্বোধ্য তার কুৎসিত ও রুচিহীন পশ্চাৎপটকে মন্ত্রচালিতের মতো অনুভব করতে পেরেছেন ভবানীপ্রসাদ। পরিণামে ভবানীপ্রসাদ হয়েছেন অর্ধোন্মাদ। অর্ধোলঙ্গ ভবানীপ্রসাদকে তাঁর নিজেরই হাতে ছেঁড়া ছবিগুলির মাঝে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করতে দেখেছে স্বয়ং অবিনাশ। আর একতলার ঘরে আবদুলের চোখে তখন রঙিন নেশা। দোতলার মালকিনের দেওয়া চড়ের প্রকৃত অর্থটা বুঝতে পেরেছে সে। নিষিদ্ধ আমন্ত্রনের সেই সংকেত আবদুলের মনকে তখন স্বপ্নাবিষ্ট করে তুলেছে।

গল্পের শেষের একটি ঘটনাই তিনতলা বাড়িটির মানুষদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও তার ফলকে প্রতিবিম্বিত করে তুলেছে। ঐ একটি ঘটনাই সমগ্র গল্পের ক্লাইম্যাক্স রচনা করে দেয় আর গল্পটিকেও প্রকৃত অর্থেই নানা মাত্রায় অর্থবহ করে তোলে। এ গল্পের চরিত্ররাও আগের গল্পের ('সংক্রমণ') মতো বিভিন্ন বয়সী। মিন্টুর বালকোচিত আগ্রহে দেখা 'না-বোঝা' ঘটনাই শিল্পী ভবানীপ্রসাদের চোখে চরম সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। যে শিল্পী এক সুস্থ

সমাজের স্বপ্ন দেখেন, তার সোনালী ভবিষ্যৎ কল্পনা করে মনের রং-এ তুলির মিশেল দিয়ে চিত্র রচনা করেন, অদূরাগত ভয়ংকর সম্ভাবনার বাস্তবতাকে তিনি সহ্য করবেন কেমন করে? পাঁকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নোংরা পচনের ইঙ্গিতকেই চাক্ষুষ করে ভবানীপ্রসাদ বিহ্বল হয়েছেন, তাঁর মানসিক বৈকল্য ঘটেছে। এ গল্পও মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বাস্তবতার পক্ষে প্রাসঙ্গিক এক আখ্যান। গল্পের শ্রেণীকরণের স্বপক্ষেও সেই কথাই বলা যায়। শম্ভু মিত্র নিজে একজন প্রথিতযশা শিল্পী। তাই শিল্পের সঙ্গে জীবনের বিরোধকে তিনি এ গল্পে এত স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারেন। ঘটনাপরম্পরায় ভবানীপ্রসাদের মানসিক বৈকল্যের ঘটনাও যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। বস্তুতঃই জীবন যখন শিল্পের নান্দনিকতাকে তার করাল দ্রংষ্টা হেনে আঘাত করতে চায় তখন শিল্পের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয় বৈ কি! জীবনের এ অসামঞ্জস্য, এ কদর্যতা গল্পের অন্যত্রও ছড়ানো। অবিনাশের পুত্র সুবিমল ও সুনির্মলের আচরণ, রিক্সায় করে যাওয়া তরুণীর পাশ ঘেঁষে মোটরগাড়ি হাঁকানোর মাঝপথে তাকে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করা, তাদের 'তিনতাসের আড্ডা' কিংবা আরো 'অন্যান্য আমিষ আড্ডায়' খরচের পেছনে লুকিয়ে থাকা কদর্যতাগুলিও সেই সামাজিক ক্ষত-দুষ্টতারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

জীবন আর শিল্পকে যে সত্যিই মেলানো যায়না 'তিনতলা' গল্পটি তারই সাক্ষরবাহী। এমন সাক্ষ্য আমরা পাই শম্ভু মিত্রের 'অসাময়িক' গল্পেও। 'তিনতলা' গল্পে রাগী আবদুলের ভাঙা চৌকির পায়ার মুর্হুমুর্হু আঘাত পড়েছে তিনতলা বাড়ির মোটা থামে। অবুঝ মিন্টুর আশংকা মতো সে আঘাতে থাম ভেঙে তিনতলা বাড়িটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েনি বটে, কিন্তু অসহ্য বাস্তবতার নিষ্ঠুর চাপে যে ভূকম্পের সৃষ্টি হয়েছে শিল্পের স্বপ্ন-সৌধটি তাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এ শিল্পী জীবনেরই এক পরাজয়। সে অর্থে গল্পটি শিল্পীসত্তার এক বেদনাদীর্ণ অনুভবকেই বহন করছে। গল্পের শেষে আবছা সন্ধ্যার অন্ধকারে তথাকথিত উচ্চবিত্ত ভদ্রতার মেকী মুখোশকে খসিয়ে যেভাবে রিরংসার হায়েনাকে জেগে উঠতে দেখেছেন শিল্পী ভবানীপ্রসাদ সেটাই হলো এ গল্পের শেষ ও চরম সত্য। যে সামাজিক শুচিতা আর শালীনতার চাদর বিছিয়ে আমরা শিল্প-সংস্কৃতি আর সভ্যতার বড়াই করি সেই চাদরের নীচেই যে এত কালিমা থাকতে পারে তা গল্পটি না পড়লে বোধহয় বিশ্বাস হতে চায় না! এক অর্থে গল্পটি গূঢ় ইঙ্গিতগর্ভ ও ব্যঞ্জনাময়। অন্যার্থে গল্পে বলা 'শিল্পের সঙ্গে জীবনের সংযোগ বড় ক্ষীণ' কথাটি যেন গল্পের শেষে সেই পরিণামী সত্যেরই স্পষ্ট সন্ধান দেয়। তৎসহ অদ্ভুত ও অসাধারণ এর গদ্য শৈলী। একটু নমুনাঃ—

> *"কোথায় একটা আলো জ্বলল। অন্ধকারের ফ্রেমে একটা চতুষ্কোণ আলোর দরজা মাজা ভেঙে সামনের দেওয়ালে পড়ল। হঠাৎ একটা সাপ যেন অন্ধকার থেকে মোচড় খেয়ে বেরিয়ে এসে ছোবল মারল। সঙ্গে সঙ্গে নিথরতা ভেঙে যেন অজস্র বাজনার আওয়াজ ঝমঝম করে উঠল ভবানীপ্রসাদের দু'কানের পর্দায়। সূর্যসন্ধ ভবানীপ্রসাদ আলো খুঁজতে গিয়েছিলেন পশ্চিমের বনে।"*[৩]

উদ্ধৃতিটি নিঃসন্দেহে ক্লাইম্যাক্সধর্মী। 'অন্ধকারের ফ্রেমে একটা চতুষ্কোণ আলোর দরজা মাজা ভেঙে সামনের দেওয়ালে পড়ল' বাক্যটিও এক সার্থক চিত্রকল্প। সেইসঙ্গে 'সূর্যসন্ধ ভবানীপ্রসাদ আলো খুঁজতে গিয়েছিলেন পশ্চিমের বনে' বাক্যটির মধ্যেও এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। ভবানীপ্রসাদের শিল্পীসত্তার অপমৃত্যুটি এ বাক্যাংশটিতে এক তীব্র ব্যঙ্গার্থ নিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'নিথরতা' ও 'সূর্যসন্ধ' শব্দদুটির প্রয়োগও এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অভিনব।

গল্পটি বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যবহ। গল্পের 'তিনতলা' নামটি যেন প্রকারান্তরে আমাদের মনের তিনটি স্তরকেই চিহ্নিত করে তোলে। এর 'অচেতন' স্তরটি যেন মিন্টু যার অবুঝ মন দিয়ে গল্পকার সন্ধান করতে চান চৈতন্যময় 'সুপার ইগো' (যা ত্রিতলবাসী শিল্পী ভবানীপ্রসাদ ও তাঁর বন্ধুস্থানীয় বিদ্বৎজনদের শিল্পময় সত্তার মহার্ঘ জগৎ) আর 'অবচেতন' মনের নিষিদ্ধ উন্মাদনাকে (যা একতলবাসী আবদুল ও তার পরিবারের নিজস্ব দুনিয়া, যেখানে আবদুলের মতো খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছায় উচ্চবিত্তের দেওয়া লোভার্ত হাতছানি আর সে সেই জীবনের ঘেরাটোপে বন্দী হতে চায়)। 'অচেতন' মনের মধ্যজীবী মানুষের (মিন্টু অথবা অবিনাশ) কাছে যা

দুর্বোধ্যতার হেঁয়ালী চিহ্ন বুকে নিয়ে অস্পষ্ট রয়ে যায় তাই 'চেতন' মনকে (ভবানীপ্রসাদ) মৃত্যুঘাতী যন্ত্রণায় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সেদিক থেকেও গল্পের 'তিনতলা' নামটি সার্থক।

'অসাময়িক' গল্পের বিষয় নাট্যশিল্পী সত্যপ্রিয় চৌধুরীকে কেন্দ্র করে। সত্যপ্রিয় নাট্য প্রযোজক ও নবনাট্য আন্দোলনের সত্যাদর্শে চালিত একনিষ্ঠ কর্মী। ফিল্ম পরিবেশকের অফিসে যাবার পথে সিঁড়ির মুখে গল্পকথক মুকুলেশের সাথে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় সত্যপ্রিয়র। এতদিন পর অকস্মাৎ ভগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু চেহারার সত্যপ্রিয়দাকে দেখে চমকে ওঠে মুকুলেশ। তারপর তাকে নিয়ে যায় পাশের চায়ের দোকানে। চা আর টোস্ট মুখে দিয়ে সত্যপ্রিয় শুরু করেন তাঁর অতীতচারণা। সেই অতীতচারণার সূত্রেই এ গল্পে উঠে এসেছে তাঁর স্বপ্নভঙ্গের মর্মন্তুদ বেদনার কথা। যে আদর্শ আর ঐতিহ্য দিয়ে সত্যপ্রিয় একদা গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নাট্যদল, সেখানেই লোভ আর প্রবঞ্চনার চোরা আঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছে তাঁকে। অর্থ, ব্যক্তিগত আকাঙ্খা সহ আত্মসর্বস্বতা, আত্মপ্রতিষ্ঠা আর নারীর লোভে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর হাতে গড়া নাট্যদলের যুবকর্মীরা। আর সবকিছু জেনে-বুঝেও অন্যায়কে মেনে নিতে হয়েছে সত্যপ্রিয়কে। তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তৈরী নাট্যদলে তিনিই ক্রমে হয়ে গেছেন অবাঞ্ছিত আর তাঁরই হাতে গড়া যুব নাট্যকর্মীরা তিরস্কার আর অবহেলায় বিদ্ধ করেছে তাঁকে। একে একে পাবলিসিটি আর সস্তা খ্যাতির মোহে খগেন, সুশান্ত, অমরেশ, প্রদীপ আর অরুনাংশুরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে আর তাদেরই বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ তিনি হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ একলা। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে সুন্দরী স্ত্রী নীলিমার উপরও নেমে এসেছে অরুনাংশুর বিষাক্ত যৌনকামনার করাল ছায়া। যে নাট্যআন্দোলনের জন্য পাঁচ বছরের ছোট্ট পুত্রকে চিরতরে হারাতে হয়েছিল সত্যপ্রিয়কে তাকেই একদিন সম্পূর্ণ একলা করে নীলিমা চলে গিয়েছে অরুনাংশুর কাছে। যাবার আগে নীলিমা সোচ্চারে বলেছে সত্যপ্রিয়কে যে, সে অসতী—সত্যপ্রিয়র অসাক্ষাতে তাঁরই বিছানায় আপন সম্মতিতে অরুনাংশুর সাথে দেহ-সংসর্গ করেছে সে। নীলিমা চলে যাবার পর ক্রমে অন্তর থেকে ভেঙ্গে পড়েছে সত্যপ্রিয়। নতুনদের নিয়ে গড়া কমিটির কাছে সত্যপ্রিয়র পুরোনো আদর্শ ঠাঁই পায়নি। নবনাট্য আন্দোলনের পুরোনো আইডিয়া, সত্যপ্রিয়র প্রোডাকশন আর পপ্যুলার নয় অথবা আধুনিক নাট্য আন্দোলনে সত্যপ্রিয়র আর দেবার কিছুই নেই ইত্যাদি ওজর তুলে খগেনদের দল পদহীন, সমর্থনহীন আর একঘরে করে দিয়েছে সত্যপ্রিয়কে। একইসাথে অভিনয় জীবন আর ব্যক্তি জীবন এই দুই-এর থেকেই সত্যপ্রিয় যখন ব্রাত্য আর নিঃস্ব তখন আবার ফিরে এসেছে নীলিমা। গল্পের একেবারে শেষে সত্যপ্রিয়র মুখ থেকে মুকুলেশ জানতে পারে অরুনাংশুর কাছে আশ্রয় নেওয়া নীলিমাবৌদি অন্তঃসত্ত্বা হবার কিছুদিন পরে আবার পালিয়ে আসে সত্যপ্রিয়র কাছে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই দ্বিতীয় সন্তানটিকেও বাঁচাতে পারেনি তারা। শেষপর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত নীলিমার অবশিষ্ট জীবনের অবলম্বনও হয়ে উঠেছে একমাত্র সত্যপ্রিয়। এ গল্পের ভরকেন্দ্রেও 'চাঁদ বণিকের পালা'-র কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মুকুলেশের চোখ দিয়ে দেখা এক নাট্যকর্মীর জীবনের সত্য উপলব্ধিই 'অসাময়িক' গল্পের মূল থিম। এ গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত। নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর দীর্ঘ নাট্যজীবনে এমন অনেক ব্যর্থ নাট্যশিল্পীকে দেখেছিলেন নবনাট্য আন্দোলনের স্বপ্ন আর আশাভঙ্গের বেদনা যাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-শান্তিকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। 'অসাময়িক' গল্পের সত্যপ্রিয় চরিত্রটি সেই ব্যক্তিগত উপলব্ধিরই অন্যতম ফসল বলে মনে হয়। গল্পে উল্লেখযোগ্য আর উজ্জ্বল এক চরিত্র হলো মুকুলেশ। এই পতনোন্মুখ আদর্শের দিনেও সে সত্যপ্রিয়কে গুরুজ্ঞানে সেবা করে। অন্যদিকে জীবন যে শিল্পের ঊর্ধ্বে নয় অথবা 'শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বড়ো ক্ষীণ' এই প্রতিপাদ্যটি যেন এ গল্পের শেষেও পাঠকের মনদর্পনে ক্রমাগত আঘাত হানতে থাকে। যে জীবনের প্রায় সবকিছু দিয়ে সত্যপ্রিয় তাঁর নাট্যশিল্পের আদর্শ আর মর্যাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল সেই জীবনও শেষপর্যন্ত তাঁর শিল্পঋদ্ধির অন্তরায় হয়ে উঠেছে। পুত্রহারা ও পত্নীহারা নিঃস্ব ও অসহায় সত্যপ্রিয়র কাছে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরা শিল্পের তাৎপর্য ও তার সত্যাদর্শ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষে শুন্যে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁকে নিয়ে মুকুলেশের নতুন নাট্যদল গড়ার শত আহ্বানও যে শালপ্রাংশুবৎ (সত্যপ্রিয় দীর্ঘদেহী ছিলেন) শুষ্ককায় সত্যপ্রিয়র ভাবরাজ্যে আর কোনো বিক্ষেপন তুলবে না তা বলাই

বাহুল্য। গল্পের প্রথম থেকেই সত্যপ্রিয় চরিত্রের অবয়ব থেকে ক্রমশঃ অন্তরের ক্ষয়কে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। ভেতরের ও বাইরের এই ক্রমাগত ক্ষয়ই সত্যপ্রিয় চরিত্রটির ভাঙনের মূল কারণ বলে মনে হয়।

শিল্পীর স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে মূর্ত হতে দেখি 'অসাময়িক' গল্পে। 'অসাময়িক' শব্দের অর্থ 'সময়ের অনুপযুক্ত' বা 'অকালিক'। গল্পের নামের মতোই সত্যপ্রিয় চরিত্রটিও যেন এ নব কালের পক্ষে অচল, অবাঞ্ছিত। নামের মধ্যে দিয়েই শিল্পের এক বেদনার্ত আত্মপ্রকাশকে লক্ষ্য করা যায়। নাটকের প্রথাগত মূল্যবোধ ভাঙছে আর সত্যপ্রিয় নিরূপায় দর্শকের মতো সে ভাঙন দেখছেন। সে ভাঙন যখন তাঁর ব্যক্তি জীবনের স্বপ্ন আর সাধকেও টুকরো টুকরো করছে তখনও তিনি এক নিরূপায় দর্শক। প্রসঙ্গ অন্য হলেও আমাদের সহসাই মনে পড়ে যেতে পারে জীবনানন্দের কবিতার সেই লাইনগুলিঃ

অনেকেরই ঊর্ধশ্বাসে যেতে হয়,
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে: সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু জনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়[৪]

সত্যপ্রিয়রা যেন এই বাকি সব মানুষেরই দলে পড়ে। তারা অসাময়িক, অপাংক্তেয়। নিজে নাট্যশিল্পী হওয়ার সুবাদে শম্ভু মিত্র সত্যপ্রিয় চরিত্রের নির্মানটিকে আরো জমাটবদ্ধ করে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয়। সেইসঙ্গে বাক্য গঠনের নৈপুণ্য ও অত্যাশ্চর্য ভাষাগত দক্ষতার কৃতিত্বও গল্পকারের প্রাপ্য। সত্যপ্রিয় সম্পর্কে লেখক বলেনঃ

> *"সত্যপ্রিয়দা আমার বাহুটা ধরে রাস্তার ভিড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন—এই হল জীবন, এ কিছুই পবিত্র থাকতে দেয় না। ভালোর মধ্যে মন্দ, আর মন্দের মধ্যে ভালো, সব জড়াজড়ি করে আছে। এখানে লখিন্দর যেমন আদরের, সাপও তেমনি আদরের। এখানে বেহুলাকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে হয় স্বর্গের সভায় নাচ দেখিয়ে। উদ্দেশ্যের জোরে নয়, যুক্তির জোরে নয়, লাস্যের অভিনয় করে। খগেনরাই ঠিক, আমি ভুল।"*[৫]

এ বর্ণনার কোনো তুলনা হয় না। এই একটিমাত্র উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়েই সত্যপ্রিয়র লাঞ্ছিত শিল্পীসত্তা আর ব্যক্তিক জীবনের জ্বালা একই সূচীমুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ ও চিরন্তনের প্রতিষ্ঠা 'অসাময়িক' গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

'অরণ্যে' গল্পটিও নাটকের সাফল্য-অসাফল্য, নাট্য আন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত। কোনো একটি নাট্যদলের বিশেষ একটি দিনের অভিনয়কে কেন্দ্র করে এ গল্পের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। 'অসাময়িক' গল্পের মতোই আত্মসর্বস্বতা, অসাধুতা, প্রতিহিংসা আর পাশবিকতা কিভাবে নাটকের ক্ষতি করে চলেছে এ নাটকটি সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করায়। বামপন্থী আন্দোলনের সাথে শিল্পের যোগ থাকা কেন সম্ভব নয় সে প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে এ গল্পের অভ্যন্তরে। সমকালীন রাজনীতি বনাম সামাজিক দ্বন্দ্ব, আত্মসর্বস্বতা বনাম প্রেমের দ্বন্দ্বও প্রকটিত হয়েছে গল্পের অবয়বে। গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সমকালীন বাস্তবতাকে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। মোহ ও মোহভঙ্গের

মধ্যে যে ব্যবধান, আলো ও আঁধারের মধ্যে যে ব্যবধান—সেই একই দ্বন্দ্ব আর ব্যবধান রয়েছে শুভ আর অশুভের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকেই (রক্তকরবী, রাজা, মুক্তধারা) এই ব্যবধান আর দ্বন্দ্বের রূপকল্পকে খুঁজে পাওয়া যায়, খুঁজে পাওয়া যায় সোফোক্লেসের 'অয়দিপাউস' নাটকেও। সেদিক থেকে রবীন্দ্র ভাবাশ্রিত নাট্যচেতনা তাঁর এ গল্পের নির্মাণশৈলীতে যে এক অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে একথা স্বীকার করতেই হয়। 'চাঁদ বণিকের পালা'-র সাথেও এ গল্পের কিছু ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। গল্পের 'অরণ্যে' নামটিকেও এই আলো-আঁধারি আরণ্যক পরিবেশের সাদৃশ্যে সার্থক বলে গ্রহণ করতে হয়।

'কালীদহে' গল্পটির মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পীর বেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পের চরিত্র এক অবগুণ্ঠনবতী নারী। সাংসারিক সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধা সে নারীটি একদা লাস্যময়ী ব্যভিচারিনীর ভূমিকায় অভিনয়কারিনী অভিনেত্রীটিকে দেখত ঘৃণার চোখে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকেই একদিন অভিনয় করতে হয় 'একস্ট্রা'-র ভূমিকায় আর বিগতযৌবনা সেই অভিনেত্রীটিকেই সে তার পাশে পায় 'একস্ট্রা' হিসাবেই। দারিদ্র্য আর ক্ষুধার জ্বালা তাদের একে-অপরকে জীবনের একই বেদীতে এনে দাঁড় করায়। গল্পটির মুখ্য কথক গল্পকার হলেও অন্য আর একটি বিশিষ্ট চরিত্রের কথনসূত্রে গল্প-বর্ণনার অভিনব কৌশলটি চোখে পড়ে। গল্পটির মধ্যে চলচ্চিত্র জগতের ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার নানা দিকের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কালীদহে' নামটিও পৌরাণিক ঐতিহ্যবাহী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কালীয়দমন খন্ড'-এ দেখা যায় কালিদহের জলকে বিষাক্ত করে তুলেছিল কালীয় নাগ। ব্রজবাসীকে উদ্ধার করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নেমেছিলেন কালীদহের জলে। তারপর একসময় শুরু হয়েছিল কালীয় নাগ ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভয়ংকর কালীয় নাগকে বশীভূত করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কালীদহে আবার ফিরে এসেছিল হীরক-দ্যুতি জল আর ব্রজবাসী ফিরে পেয়েছিল তাদের প্রার্থিত শান্তি। কিন্তু পুরাণের এই ঘটনা বাস্তব পৃথিবীতে ঘটে না। এখানে সমাজ-কালীদহের নোংরা কর্দমের বুকে জেগে থাকে অজস্র চোরা পাঁক। সেই পাঁকে আছে শুধু অর্থের উল্লাস আর ইজ্জতের বিসর্জন। নারীর সম্মান সেখানে ডুবে মরে কামনার বিষাক্ত ছোবলে। সেখানে কোনো কৃষ্ণ আসে না বিষের এ নীলিমা থেকে তাকে উদ্ধার করতে। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির চোরা পংকিলতায় কিভাবে ভেসে যায় নারীর সতীত্ব, জীবন ও যৌবন তা এ গল্পে 'একস্ট্রা'-দের রূপকল্পে তুলে ধরেন গল্পকার। সেদিক থেকে গল্পের নামকরণটি ব্যঙ্গাত্মক ও ব্যঞ্জনাময়।

'স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য' গল্পটি অন্যান্য গল্পের তুলনায় গোত্রে কিছুটা আলাদা। সে কারণেই এ গল্পটির প্রসঙ্গ শেষে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে গোত্রে আলাদা হলেও এ গল্পের মূল সুরটিও কোথায় যেন অন্যান্য গল্পের সাথে মিলে যায়। তা হলো, এ গল্পের মধ্যেও শম্ভু মিত্রের সৃষ্টিশীল অন্তঃসত্তার বহিঃপ্রকাশের এক বেদনার্ত অনুভবকে খুঁজে পাওয়া যায়। সেই বেদনার্ত বহিঃপ্রকাশ শতধা ধারায় বাধাবন্ধহীন মুক্তাকাঙক্ষার প্রয়াসী। গল্পের সুজন যেন গল্পকারেরই নিজস্ব আত্মপ্রক্ষেপ। গল্পটি নাট্যরূপায়ণের পক্ষেও একেবারে আদর্শ।

এ গল্পের মূল চরিত্র সুজনকে গল্পের একেবারে গোড়ায় মৃত অবস্থায় দেখা যায়। এক ঝাপসা নীল চন্দ্রলোকিত কক্ষে অশরীরী ছায়ার মতো স্ত্রী-পুরুষের দল তার দেহকে ঘিরে ভিড় করে। তাদের চলা-ফেরা, ধরন-ধারন সবই যেন মনের মাঝে অনুভূত হয়। এক হাত দৈর্ঘ্যের অসম্ভব রকমের বেঁটে, ন্যাড়া মাথার তিনটে লোক, কোণের টেবিলের ধরা গলার লোকটি অথবা স্ত্রীলোকটি—এদের সবাই যেন রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আড়াল থেকেই উঠে আসা। স্ত্রীলোকটি তাকে 'বুবলু' বলে ডাকে আর নিজের পরিচয় দেয় তার মা অথবা স্ত্রী অথবা বন্ধু বলে। ক্রমে স্ত্রীলোকটির সাথে ধরাগলার লোকটির প্রবল তর্ক বেঁধে যায়। ধরাগলার লোকটি সুজনের জীবনে আসা আর একটি নারীর পক্ষ নেয়। স্ত্রীলোকটি তার বিরোধিতা করে। নিঃশব্দ কক্ষে স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর কখনো অপরিসীম বেদনায় কাঁপতে থাকে, কখনো বসন্তের কথার জবাবে হিংস্র ভাবে চিৎকার করে ওঠে সে। এরপর হাজির হয় কালো আঙরাখায় সর্বাঙ্গ ঢাকা এক রাজকীয় ব্যক্তি। সে শয়তান। অভিনেতাসুলভ গম্ভীর ও চড়া গলায় সে বুবলুকে জাগতে বলে। কিন্তু সে জাগে না। এরপর চঞ্চল হাওয়ার এক তীব্র ঘূর্ণাচক্র তার কেন্দ্রিক জঠরে

'স্ত্রীলোক', 'ধরাগলা', 'এই' আর 'বেঁটে তিনটি লোক' সহ সবাইকে নিয়ে মুহূর্তে হারিয়ে যায়। চাঁদের ম্লান আলোয় স্রোতহীন সুষুপ্তির গর্ভে ধীরে ধীরে উত্থিত হয় অন্য আর এক নারী। জলের মধ্যে থেকে অদৃশ্য সোপান বেয়ে সম্পূর্ণ শুষ্ক দেহে তীরে প্রবেশ করে সে। তারপর তার রোগা আর শক্ত দেহখানি নিয়ে বালি মাড়িয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হয় সেই ছাদহীন ঘরটায়। মৃত লোকটির পানে চেয়ে তাকে -'সুজন' বলে ডাকে সে। সুজন এবারে চোখ মেলে। কথা বলে সেই নারীর সঙ্গে। কিন্তু প্রিয়তমার ডাকে সাড়া দিলেও সে আলোর ভেলায় চড়ে তার সাথে স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে সহজ হতে চায়। সুজনের কথায়ঃ——"না, জীবনকে আমি কিছু করতে চাই না। আমি জীবন হতে চাই। আমার চোখকে আমি মাথা থেকে উপড়ে ফেলে সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে দেব। জগতের সমস্ত কিছুকে আলিঙ্গন করে অনুভব করব আমার মনহীন অবয়বে।"[৬] সে আরো বলেঃ——"আমার মনগত সংকীর্ণ আমিকে ভেঙে আমার বৃহত্তম আমিকে আমি পেতে চাই। আমি সহজ হতে চাই। আমি বাঁচতে চাই মাছের মতো অন্ধ সঞ্চারনে সেই মহা অন্ধকার সমুদ্রগর্ভে।"[৭] শয়তান তাকে নিরস্ত করার নানা চেষ্টা করলেও সুজনের আর্তনাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অন্ধকার অস্তিত্বে ফিরে যাবার, নিমজ্জিত হবার বা একেবারে হারিয়ে যাবার ব্যগ্র আকুতি।

এ গল্পের মধ্যে দিয়ে চল্লিশের দশকের গল্পের অন্যতম উপজীব্য 'অস্তিত্বের নিরর্থকতা ও সংকট'-কে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। গল্পটি উদ্ভট নাটকের মতোই সংকেত ও ব্যঞ্জনাময়। একসময় ইউরোপীয় প্রতীকীবাদী আন্দোলনের (Symbolic Revolition) পথিকৃৎ মেটারলিঙ্ক, হপ্টম্যান-এর পথ ধরে কবিতা লিখেছিলেন স্বয়ং কবি জীবনানন্দ দাস। চৈতন্যপ্রবাহ (Stream of Conciousness)-এর প্রতিফলনও ঘটেছিল তাঁর কিছু কিছু কবিতায় (যথা 'আট বছর আগের একদিন')। যে চৈতন্যপ্রবাহকে ফ্রানৎস্ কাফকা কিম্বা জেমস জয়েস-এর মতো গল্পকাররা একসময় তুলে ধরেছিলেন তাঁদের গল্পে সেই চৈতন্যপ্রবাহের প্রতিফলন রয়েছে এ গল্পেও। চেতনার মাঝখানে আপনার নিজস্ব স্থানটুকু খুঁজে ফেরার আত্ম-অনুসন্ধান রয়েছে এ গল্পের মর্মমূলে। মর-জীবনের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম আকিঞ্চনটুকু এ গল্পে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ যেন শিল্পীসত্তারই নব উন্মোচনের অন্ধ বাসনা। গল্পে দেখি শয়তানের কথায়—'যে অন্ধকারের বন থেকে মানুষ একবার বেরিয়ে এসেছে সেখানে পুনরায় ফিরে যাবার পথ তার আয়ত্তের বাইরে'—এই আপ্তবাক্যকে মিথ্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে সুজন। একা 'নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে হাঁফিয়ে' ওঠা সুজনই শুধু নয়, বরং পরোক্ষে তা লেখকের শিল্পীসত্তার বেদনাকেই প্রতিবিম্বিত করে। মনে রাখতে হবে, এ গল্পের বিষয়বস্তুতে এক সুকঠিন নৈর্ব্যক্তিকতা লুকিয়ে আছে। গল্পের নাম 'স্বপ্নের মাঝে একটি দৃশ্য' হওয়ায় তার এই Abstraction বা 'স্বপ্নাচ্ছন্নতা' (Dreaminess)-কে আমাদের মেনে নিতে হয়। জীবনের বিরুদ্ধে, অস্তিত্বের বিরুদ্ধে, ভালো লাগা ও ভালোবাসার বিরুদ্ধে যা কিছু পথ আগলে দাঁড়ায় তাকে প্রতিরোধ করা বা ভেঙে ফেলাই হলো জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, তাই-ই হলো 'সহজতা'। কিন্তু বৈপরীত্য আর বিরুদ্ধতা যখন শিল্পী-মনে কঠিন সংকটের জাল মেলে, তাকে জাগতিক সমস্ত সতেজতা আর সজীবতার জগৎ থেকে উচ্ছিন্ন করে এক কৃত্রিম আলোকময় ফেনিল জগতের অধিবাসী করে তুলতে চায় তখনই অন্তরের আকুলতা আর বেদনা বেড়ে যায়। আর যে অন্ধকারের বুক চিরে সেই অভিমানী বেদনার জন্ম হয়, শিল্পীসত্তা আবারও সেই গর্ভাভিমুখে ফিরে যেতে চায়। নিরস্ত প্রতিবাদ তখন ঘুম চায়, আরো গাঢ়—ঘুম। সেই-ই তার আত্মাভিমানের তীব্র অভিলাষ, পরম প্রাপ্তি। স্বপ্ন আর কল্পনার জগতের মধ্যে দিয়ে যেভাবে গল্পকার বাস্তবকে প্রতিপন্ন করে তুলতে চেয়েছেন সেখানেই রয়েছে গল্পটির যাবতীয় সাহিত্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঐশ্বর্য। এ গল্পে যেমন রয়েছে রোমান্স রস, তেমনই কাব্যিকতা আর নাটকীয়তার প্রবল উচ্ছ্বাসও রয়েছে সেখানে। গল্পটিকে বিমূর্ত ভাবচেতনার এক মূর্ত অভিব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করলেও এর ভাবগত মূল্যাংশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

তথ্যসূত্র :

১. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'সংক্রমণ' গল্প, পৃষ্ঠা ২০৭ দ্রষ্টব্য
২. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'সংক্রমণ' গল্প, পৃষ্ঠা ২০৮ দ্রষ্টব্য
৩. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'তিনতলা' গল্প, পৃষ্ঠা ২১৬ দ্রষ্টব্য
৪. ১৯৪৬-'৪৭, জীবনানন্দ দাশ
৫. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'অসাময়িক' গল্প, পৃষ্ঠা ২২৮ দ্রষ্টব্য
৬. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'স্বপ্নের মাঝে একট দৃশ্য' গল্প, পৃষ্ঠা ২০৪ দ্রষ্টব্য
৭. শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, 'স্বপ্নের মাঝে একট দৃশ্য' গল্প, পৃষ্ঠা ২০৪ দ্রষ্টব্য

সহায়ক গ্রন্থ :

১। শম্ভু মিত্র: রচনা সমগ্র-১, সম্পাদনা শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০১৪
২। শম্ভু মিত্র: বিচিত্র জীবন পরিক্রমা, শাঁওলী মিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০১১
৩। শম্ভু মিত্র: নাট্যভাব, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৬
৪। শম্ভুদা: পুনশ্চ, দেবতোষ ঘোষ, কারিগর, বইমেলা, ২০১৬